আধা-সামন্ততন্ত্র:

সামন্ততান্ত্রিক প্রথা যে ঠিক কাকে বলে এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ রাজা থেকে ভূমিদাস পর্যন্ত সব মানুষকে নিয়ে সমাজের যে জটিল ও চুক্তিসম্মত ব্যবস্থা মধ্যযুগের ইউরোপে প্রচলিত ছিল তার ভিতরেই এর সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী। আবার অনেকে সামন্ততন্ত্র কথাটির প্রয়োগ বেশ শিথিলভাবেই করে থাকেন। যে ব্যবস্থাতে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রধানত ভূম্যধিকারীদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তাকেই তাঁরা সামন্ততন্ত্র বলে নির্দেশ করেন। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের দলভুক্ত যাঁরা নন তাঁরা অধিকাংশই সং কীর্ণতর সংজ্ঞাটির পক্ষপাতী। আর সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী বিচার করতে গেলে প্রাচীন ভারতে খাঁটি সামন্ত্রতন্ত্র কদাপি ছিলনা। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা অবশ্য মুসলমান আক্রমণের পরে রাজপুতদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইতিহাসের সেই যুগ আমাদের বর্তমান আলোচনার গণ্ডির বাইরে। প্রাচীন ভারতে প্রভুর উপরে প্রভু থাকার যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা অবশ্য কতকটা সামন্ততন্ত্রের মতই। কিন্তু ইউরোপে ও পদ্ধতি যতটা পূর্ণতা লাভ করেছিল ভারতে যে তা করেনি তার কারণ এখানে তার মূল ভিত্তিই ছিল আলাদা।

বৈদিক যুগের শেষের দিকেই আমরা দেখতে পাই যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রভুরা বড়ো প্রভুদের রাজকর দিয়ে থাকেন। প্রাচীন রচনাদিতে 'অধিরাজ' ও 'সম্রাট'- এই দুটি কথার প্রয়োগ দেখি। করদ রাজ্যদের উপর প্রভুত্ব করার ইংগিত এই শব্দ দুটির ভিতরে রয়েছে। মগধ সাম্রাজ্যের লক্ষ্য ছিল একটি কেন্দ্রীভূত রাজ্যশাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা-যদিও মৌর্য যুগেই সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে করদ প্রধানদের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। মৌর্যদের পতনের পর বড়ো বড়ো রাজ্য যা গড়ে উঠেছিল সেগুলিতে থাকতো কেন্দ্র ও তার সন্নিহিত স্থানে প্রত্যক্ষভাবে শাসিত এক অঞ্চল-যার চারদিক ঘিরে বৃত্তাকারে করদ রাজ্যগুলির সমষ্টি। এই করদ রাজ্যগুলির আনুগত্য কম বা বেশি পরিমাণে

থাকতো কেন্দ্রাধিপতি সম্রাটের প্রতি। আবার তাদের অধীনে ক্ষুদ্রতর করদ রাজ্য থাকতো একাধিক। তাদের মাথায় থাকতেন ছোট মাপের স্থানীয় প্রধানরা এবং তাঁরাও নিজেদের রাজা বলেই পরিচয় দিতেন। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সংগে ভারতীয় এই ব্যবস্থার পার্থক্য এখানে যে প্রভুর উপর প্রভু থেকে শুরু করে নিম্নতম প্রজা পর্যন্ত নিয়ে যে সমাজ তার মধ্যে কোনো চুক্তি বা শর্তের স্থান ছিলনা। ইউরোপীয় ভুম্যাধিকারীদের খাসতালুক বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু ছিলনা প্রাচীন ভারতে। তবে তার কাছাকাছি ব্যবস্থা গড়ে উঠতে যাচ্ছিল প্রাচীন যুগের একেবারে শেষের দিকে।

যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাভব ঘটলে পরাস্ত রাজা বিজেতার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে নিজের সিংহাসন বজায় রাখতে পারতেন। করদ রাজারা এদেশে চুক্তির ফলে উদ্ভূত হননি, হয়েছেন যুদ্ধে পরাজিত হবার ফলে। অবশ্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্বল জাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেন প্রয়োজনে প্রতিবেশী পরাক্রান্ত উজার কাছে স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এই জাতীয় ব্যবস্থার সমর্থন ছে রামায়ণ ও মহাভারতে এবং স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে। এসব গ্রন্থে যুদ্ধ করে শত্রুরাজ্য এম্পূর্ণ ছিনিয়ে নেবার সপক্ষে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। 'ধর্মবিজয়' বলতে বোঝায় না বিজিত রাজ্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেওয়া। বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে কর প্রদান করলেই সন্তুষ্ট থাকা ছিল অনুমোদিত পন্থা। পরবর্তীকালে অবশ্য

কোনো কোনো খাজা-সমুদ্র গুপ্তের কথা এ প্রসংগে বলতে হয়-স্মৃতির এই অনুশাসন অগ্রাহ্য করে বিজিত রাজ্য নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এ কাজ কিন্তু তৎকালীন প্রথাসম্মত হয়েছিল বলা চলবে না।

প্রভুর উপরে যিনি প্রভু তাঁর শাসন কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কতটা কঠোর ছিল? আদর্শ ব্যবস্থা ছিল এই যে করদ রাজা তাঁর সম্রাটকে নিয়মিত কর দিয়ে যাবেন এবং যুদ্ধের সময় তাঁকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করবেন। আর উৎসব ও অনুষ্ঠানাদির সময় তিনি সম্রাটের দরবারে উপস্থিত থাকবেন। মধ্যযুগের শক্তিশালী সম্রাটদের স্তবগাথায় নিয়মিত উল্লেখ পাওয়া যায় করদ রাজাদের উষ্ণীষে খচিত মণিমুক্তার যা তাঁরা সম্রাটের সামনে নত হয়ে অভিবাদন করার সময় আন্দোলিত সূর্যকরোজ্জ্বল সমুদ্রতরংগের মতো ঝলমল করত। করদ রাজাদের ঘোষণাপত্রে নিজেদের নাম উল্লেখ করার আগে রীতি ছিল তাঁরও যিনি প্রভু অর্থাৎ যে সম্রাটকে তিনি কর দেন তাঁর নাম উল্লেখ করার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে সম্রাটের প্রতিনিধি করদ রাজার রাজ্যে উপস্থিত রয়েছেন সেখানকার পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য। করদ রাজার পুত্রেরা অনেক সময় তাঁর প্রভুপুত্রদের সংগে লেখাপড়া শিখতো। এই প্রভুপুত্রদের অনুচরবৃন্দের ভূমিকাতে দেখা যেত

তাদের। করদ রাজার কন্যাদের উপরে দাবী থাকতো সম্রাটের এবং তারা প্রায়শঃই স্থান পেত তাঁর অন্তঃপুরে। অনেক সময় করদ রাজা তাঁর প্রভুর মন্ত্রী হিসেবে কাজ করতেন। আবার অনেক সময় সম্রাট তাঁর কোনো মন্ত্রী বা প্রিয়পাত্রকে নিযুক্ত করতেন করদ রাজা হিসেবে। ফলে মধ্যযুগে প্রায়ই দেখা যেত যে মন্ত্রী ও করদ রাজার পদমর্যাদা মিশে গেছে। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সম্রাটেরই প্রসন্ন সম্মতির বলে নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন এবং পদাধিকার বলে তাঁর সামন্তরাজ হিসেবে পরিগণিত হতেন।

এঁদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি হলেন মহাসামন্ত। তাঁর ক্ষমতা ছিল প্রভূত। নিজস্ব শাসনযন্ত্র ও সেনাদল থাকতো তাঁর অধীনে। রাজার নিরাপত্তা বিপন্ন হবার আশংকা ছিল যত দিক থেকে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধানগুলির অন্যতম ছিল করদ রাজা বিদ্রোহী হয়ে ওঠা। এর চমৎকার সব উদাহরণ পাওয়া যাবে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে চালুক্য রাজবংশেরই আধিপত্য ছিল সেখানে। তাঁদেরই এক করদ রাজা-দন্তিদুর্গ রাষ্ট্রকূট তাঁর নাম-চালুক্যদের পতন ঘটিয়ে তাঁর নিজের বংশকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। চালুক্যরাই হীন করদ রাজায় পরিণত হন। কিন্তু মোটামুটি দুশো বছর অতিক্রান্ত হবার পর রাষ্ট্রকূটরা দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন সেই সুযোগে চালুক্যরা তাঁদের প্রাধান্য পুনরায় অর্জন করে নিয়েছিলেন। এ প্রাধান্য তাঁরা বজায় রাখতে

পেরেছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। তখন তাঁদের করদ রাজা ছিলেন যাদব, কাকতীয় ও হোয়সল বংশীয়রা। তাঁরা নিজেদের মধ্যে সমভাবে রাজ্যাধিকার বন্টন করে নিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে রাজাধিরাজের কর্তৃত্ব তাঁর দূরবর্তী ও শক্তিশালী করদ রাজাদের উপর ছিল খুবই মৃদু ও সামান্য। নতি স্বীকার করে কর প্রদানের দাবী মেটানো হত নামে মাত্র। উদাহরণস্বরূপ তোলা যায় সমুদ্র গুপ্তের কথা। তিনি এমন দাবীও করতেন যে সিংহলের রাজা শ্রী মেঘবর্ণ তাঁর একজন করদ সামন্ত। কিন্তু নির্ভরযোগ্য এক চীনা সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে এ দাবীর ভিত্তি শুধু এই যে তাঁর আমলে সিংহল থেকে উপহার বহন করে একটি দল এদেশে এসে রাজ-অনুমতি চেয়েছিল পুণ্যভূমি গয়াতে এক বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করার।

যে সব করদ রাজা তেমন শক্তিশালী বা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না তাঁরা মধ্যযুগে ইউরোপে খাসতালুকভোগী সামন্তদের চেয়ে বেশি গৌরবের অধিকারী ছিলেন বলা চলে না। তবু তাঁরা কসুর করতেন না নিজেদের রাজা বলে দর্পিত ঘোষণা করতে। এই সূত্রে দক্ষিণ বিহারে দুধপানি নামক স্থানে অষ্টম শতাব্দীর এক শিলালেখতে বর্ণিত নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক কাহিনীটির উল্লেখ করা যায়ঃ

তিনজন বণিক ভ্রাতা তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে তাঁদের বাড়ি অযোধ্যাতে ফিরে আসছিলেন। সংগে ছিল তাঁদের শকটের সারিতে বোঝাই করা বহুবিধ পণ্যদ্রব্য ও খাদ্যের সম্ভার। পথে এক রাতের জন্য ভ্রমরশাল্মলী নামক গ্রামে তাঁরা বিশ্রামরত ছিলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় রাজা আদিসিংহ

বেরিয়েছিলেন শিকারে, সংগে তাঁর অধীনস্থ প্রচুর লোকজন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তিনি গ্রামবাসীদের কাছে দাবী করলেন তাঁর এইসব লোকজন ও অশ্বাদির জন্য আহার্য। তখনকার মতো গ্রামবাসীদের কাছে কিন্তু অত খাদ্য ছিল না। সুতরাং তারা তাদের কয়েকজনকে পাঠালো বণিকত্রয়ের কাছে। তাঁরা তাদের অনুরোধে নিজেদের সঞ্চয় থেকে খাদ্যাদি হ করলেন রাজাকে। তিন ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ ছিলেন উদয়মান। তাঁর সাইজাজার খুব ভালো লেগে গেল। ফলে তিন ভ্রাতা রাজা আদিসিংহের সভাসদ হলেন। পরে একদিন উদয়মান ঐ গ্রামে আরও একবার আসেন। তাঁর বদান্য আত্মাণের কথা স্মরণ করে গ্রামবাসীগণ তাঁকে তাদের রাজা হতে অনুরোধ করল। S রাজনা আদিসিংহ অনুমোদন করলেন এই অনুরোধ। ফলে বণিক উদয়মান হলেন ভ্রমরশাল্মলীর রাজা। আর তাঁর অপর দুই ভাইকেও পার্শ্ববর্তী দুটি গ্রামের রাজা করে দেওয়া হল।

এই ক্ষুদ্রাকার গল্পটি কি ভাবে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল তারই এক উদাহরণ। মৌর্য যুগের পর থেকে ক্রমে রাজারা তাঁদের কর্মচারী ও প্রিয়পাত্রদের পুরস্কৃত করা শুরু করলেন অর্থ দিয়ে নয়, কোনো গ্রাম বা কতিপয় গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করার অধিকার অর্পন করে। এই অধিকারের সংগে প্রায়শই যুক্ত থাকতো অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। খাজনা আদায় করার অধিকার ও এরকম অন্যন্য সুযোগ-সুবিধা যাঁরা ভোগ করতেন তাঁরা হয়ে দাঁড়াতেন রাজা ও করদাতাদের মধ্যবর্তী এক শ্রেণী। এতে ক্ষমতার ক্রম-হস্তান্তর, রাষ্ট্রের গঠন শিথিল হতে থাকা এবং তার বিভিন্ন অংশের ভিতর বিশৃংখলা দেখা দেবার প্রবণতা প্রশ্রয় পেত।